

গভীরতার গুরুত্ব

সাজ্জাদ জহির

১৯৩৪ সাল।

চীনে কমিউনিস্টদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাটি জিয়াংশি ঘেরাও করতে হাজির হয় চিয়াং কাই শেকের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদীরা।

৫ লক্ষাধিক সেনা নিয়ে ঘেরাও করায়, সম্মুখ সমরের পরিণতি ছিল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া।

তাই সেখানে থাকা কমিউনিস্টরা নিজেদের পরিবার-পরিজনকে পেছনে ফেলেই অন্যত্র যাওয়ার পরিকল্পনা করে।

প্রায় ৯০০০০ কমিউনিস্ট নিরাপদ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে দুর্গম সফর শুরু করে। পরবর্তীতে জিয়াংশিতে প্রবেশ করে কমিউনিস্টদের না পেয়ে- পেছনে রেখে আসা কমিউনিস্টদের স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতাদের জাতীয়তাবাদীরা কচুকাটা করে। বলা হয় জিয়াংশির গাছগুলোর প্রতিটি ডালেই কমিউনিস্টদের ঘনিষ্ঠজনদের লাশ ঝুলেছিল।

কমিউনিস্টদের এই দলটি এক বছরে প্রায় ৬০০০ মাইল পায়ে হেটে সফর করে। পথিমধ্যে বেশ কিছু লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

সমতল-পাহাড়, গ্রাম-শহর, গ্রাসল্যান্ড-নদী পার হয়ে কমিউনিস্টরা শেষ অবধি সানসিতে (Shanxi) পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এই সফরকেই ইতিহাস বিখ্যাত “লং মার্চ” নামে চিনে থাকে।

লং মার্চ শেষ হওয়ার সময় মাত্র ৮-৯০০০ কমিউনিস্ট টিকে ছিল।

বাকি সবাইই পথিমধ্যে পালিয়ে যায়, নিহত হয় বা মারা যায়। অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চার ভাগ সদস্যই গায়েব হয়ে যায়।

কিন্তু চরম সংকট আর বিপর্যয়ের মুখে টিকে থাকা অল্পসংখ্যক কমিউনিস্টদের আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তা চীনা জনগণের মধ্যকার অগ্রগামী অংশকে অভিভূত করে ফেলে।

মাত্র ৭ বছরের মাথায় ইয়ানানে (সানসিতে থেকে অগ্রসর হয়ে কিছুদিন পর কমিউনিস্টরা ইয়ানানে ঘাটি নির্মাণ করে) থাকা কমিউনিস্টদের অনুসারী ও সহযোগী ৪০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪,০০,০০০ এ গিয়ে দাঁড়ায়। কারণ তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২০০০০ মানুষ (লং মার্চ সারভাইভর এবং আগে থেকে সাংসি ও ইয়ানানে থাকা কমিউনিস্টদের মিলিয়ে), যাদের সক্ষমতা ছিল বিশাল জনগোষ্ঠীকে গ্রহণ করার ও নেতৃত্ব দেয়ার।

এই লং মার্চের মাধ্যমেই সংগঠনের নেতৃত্বের সারিতে উঠে আসে মাও সেতুং, পেং দে হুয়াই, চৌ এন লাই, দেং শিও পিং, লিও

শাউচি, লিন পিয়াওরা...

যারা বছর পনের পর গোটা চীন বিজয়ে নেতৃত্ব দেয়।

আরেকটি উদাহরণ।

১৯০৩ সাল। রাশিয়া। সংগঠিত হবার অল্প সময় অতিবাহিত হবার পরই বিভক্ত হয় সমাজতান্ত্রিকদের দল RSDLP. বলশেভিক ও মেনশেভিক ফ্র্যাকশনে বিভক্ত হয় নেতাকর্মীরা।

বিভক্ত হবার পর, বলশেভিক পার্টির সূচনালগ্নে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০০ এর মত।

১৯০৫ সালের অভ্যুত্থানের পর প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পাবার পর ১৯০৭ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ১,৫০,০০০ এ।

কিন্তু পরবর্তী দুই বছরে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পিওতর স্টোলিপিনের (আমাদের সময়ের ডক্টর ইউনুস বা এখনকার ডানপন্থী শাসকের মত) উদারনীতি ও রিফর্মেশনের ধাক্কায় ১৯০৯ সালে তাদের সদস্য কমে দাঁড়ায় ১০০০০ এ।

১৯০৫-এর গণজোয়ার স্তিমিত হওয়ার পর সাধারণ শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে হতাশা ও নিরাসক্তি দেখা দেয়। অনেকেই মনে করেছিল বিপ্লবের সময় ফুরিয়ে গেছে, ফলে তারা সংগঠন থেকে দূরে সরে যায়।

এই সময়ে শিল্পক্ষেত্রে কিছুটা স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি আসে, যা শ্রমিক অসন্তোষের তীব্রতা কমিয়ে দেয়। যার ফলে দলে দলে সংগঠন ত্যাগ করে মানুষ ছাপোষা জীবনযাপনকেই বুদ্ধিমানের কাজ সাব্যস্ত করে ঘরে ফিরে যায়।

মানুষ এমনই। প্রকৃত চেতনা রাতারাতি আর ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে না। তা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মানুষ অবস্থা দেখেই ব্যাবস্থা নেয়। কেবল বিশেষ ও পরীক্ষিত ব্যক্তিদের কথা আলাদা।

পরবর্তী বছরগুলোতে ব্যাপক মেহনত সত্ত্বেও, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর বলশেভিকদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০০০ এ।

কিন্তু জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটলো, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর সকল বিরোধী দল যখন ক্ষমতার কেকের ভাগ নিতে ব্যস্ত, তখন বলশেভিকরা সংস্কারের মাঝে সন্তুষ্ট থাকতে চাইল না। তারা দূরে থাকলো। বিপ্লবী ও সাংগঠনিক বিপ্লবিতা, ধারাবাহিক সংগ্রাম আর আন্দোলনের পথকেই বেছে নিল।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতার দায় গায়ের উপর না আসায় এবং ১৯১৭ সালের জুলাইয়ের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর সরকারের ব্যাপক দমনপীড়নের মোকাবিলায় বলশেভিকরা যখন টিকে গেল, তখন অব্যবহিত সময় পরেই বিপ্লবী তরঙ্গোচ্চাসে বলশেভিকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৪০,০০০ এ। ঠিক যেমনটা চীনের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

কিন্তু এই সংখ্যা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে রাতারাতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, ক্ষমতায় আরোহণ সত্ত্বেও- বলশেভিকদের বেশ জটিলতার সম্মুখীনও হতে হয়। অন্যান্য অনেক কারণের পাশাপাশি নতুন করে ক্ষমতালাভের পর যোগ দেয়া অধিকাংশ সদস্যদের দক্ষতার অভাব (যেহেতু অধিকাংশই নতুন যোগ দেয়া) এবং সদস্যদের শ্রেণীস্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক চাহিদার চাপে সংগঠন ও রাষ্ট্রের নেতারা তাদের ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য থেকে কিছুটা সরে আসতে বাধ্য হয়। এজন্য তাদের “নিউ ইকোনমিক পলিসি (NEP)” গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ, ইনফ্লেক্সের আগের মূল নিয়ামক অংশের এক অর্থে আরো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

যাই হোক। পরবর্তীতে, আদর্শ ও লক্ষ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার তাগিদ থেকে লেনিন সংগঠন থেকে প্রায় ১ লাখ সদস্য বের করে দেয়। শুধু সংখ্যা যে রিসোর্স নয়, অনেক ক্ষেত্রেই লায়ালিটি তা বোঝা সম্ভব হয়। লেনিনের লেখা শেষ প্রবন্ধের নাম ছিল “Fewer, but Better Fewer”।

অর্থাৎ, কোনো সংগঠনের আকার গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তা চূড়ান্ত বিষয় নয়। বরং লক্ষ্য ও প্রক্রিয়াতে সঠিক অবস্থান বজায় আছে কি না এটাই মুখ্য। আল্লাহ তা আবার ফয়সালায় জনমানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে, যদি উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো, সংগঠক ও নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এছাড়া স্রেফ সংখ্যা বিশেষ ফল দিবে না, যদিও সংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ।

সীরাহ থেকে বদর, উহুদ, হামরাউল আসাদ, খন্দকের যুদ্ধ থেকে হুবহু এশিক্ষা আমরা আরো গভীরভাবে যথাযথভাবে পাই।

চীন ও রাশিয়ার উদাহারন কেবল সমসাময়িক বিবেচনায় নয়, বরং ধীরগতিতে অবিচলতার সাথে লেগে থাকা ও better fewer কেন্দ্রিক চিন্তা যে মূলত সার্বজনীনভাবেই যথার্থ, তা ইংগিত করতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি:

إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَاذُ فِيهَا رَاحِلَةٌ

"নিশ্চয়ই মানুষের দৃষ্টান্ত হলো একশত উটের মতো, যার মধ্যে তুমি একটিও সওয়ারি বা আরোহণের উপযোগী (উন্নত মানের) উট পাবে না।" [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে আমাদের দেশে ইসলামপন্থীদের কর্মকাণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক নেতা, এক দল নীতিতে আটকে যায়। নেতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এককেন্দ্রিক দলের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে সফল না হওয়াই স্বাভাবিক।

অথচ, ইতিহাসের কষ্টপাথরে উত্তীর্ণ জামাতগুলোর দিকে নজর দিলে আমরা অন্যরকমই দেখি। কোনো জামাতের নেতৃত্ব ও সংগঠন গভীরতা অর্জন করা ব্যাতিত, ব্যাপকভাবে অগ্রসর হওয়ার পরিণতি শেষ অবধি আপস, আত্মসমর্পণ বা রণে ভঙ্গ দেয়ার মাধ্যমেই শেষ হয়। ইসলামের জন্য চেষ্টায় রত প্রতিটি জামাতকেই বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া উচিত।

উপযুক্ত, পরিপক্ক সংগঠন বিশেষ রাজনৈতিক মুহুর্তে গণজোয়ারকে নিজেদের দিকে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তখন মানুষ

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসে। শুরুতেই জনপ্রিয়তার স্রোতে অবগাহন করলে বা অতিরিক্ত গণমুখী হলে সুসংহত, আত্মত্যাগী মানুষের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ চাকচিক্য ও গ্রহণযোগ্যতা দেখে ঢালাওভাবে সবধরনের মানুষই আসে।

তাই, কঠিন পরিস্থিতি আর উত্থানপতনের মধ্য দিয়েই সংগঠনকে নিজ অবস্থান তৈরি করতে হয়। সংকীর্ণতার মুখোমুখি না হয়ে কেবল জনপ্রিয়তা ও সম্ভাবনা দেখে আসা মানুষের উপর কঠিন মুহুর্তে বড় কিছু আশা করা কঠিন। গতানুগতিকতার মাঝেও মনোযোগ ও উদ্যম ধরে রাখা কেবল সাক্ষা বিপ্লবীদের পক্ষেই সম্ভব।

প্রত্যাখ্যাত ও প্রতারণিত হওয়া সত্ত্বেও পথের যথার্থতা ও সাফল্যের আশায় আল্লাহর দিকে তাকিয়ে লেগে থাকা কেবল গভীরতাসম্পন্ন মানুষের মাধ্যমেই সম্ভব। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আসেন, কুরআন-সুন্নাহ ও কর্মকৌশলগত যথার্থতা দেখে আসেন, আত্মত্যাগের গুরুত্ব অনুধাবন করে আসেন, মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিবে জেনেই আসেন, প্রকৃত সঙ্গী-সাথী কমই হবে জেনে আসেন- তারাই অপথের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে আল্লাহর ইচ্ছায়।

বিপরীতে যারা চাকচিক্য আর ক্যারিশমার খোজ করেন, সংখ্যা আর প্রতিপত্তিই যাদের কেন্দ্রীয় মোটিভেটিং ফ্যাক্টর- তাদের জন্য অপথের বোঝা বহন সহজ হবে না; সম্ভব হবে না একঘেয়েমিতার ব্যাধি থেকে বেচে থেকে মনোযোগ ধরে রাখার, মুহূর্মুহু বাধা ও সংকটের মুখেই অবিচল থাকা কিংবা প্রলোভনের মুখে পিছলে না যাওয়া। ইতিহাস ও বাস্তবতা আমাদের এমনটাই জানায়।

সঠিক প্রক্রিয়াতে, প্রলোভন বা নিপীড়নের মুখেও যে সাংগঠনিক শক্তি আত্মত্যাগী, আপসহীন থাকে; দৃঢ়তার সাথে অন্যায়কে মোকাবেলা করে, তখনই জনগণ বিদ্যমান শাসনব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ঐ সংগঠিত শক্তির পরিবর্তনের দাবিতে সম্মত হবার কথা ভাবে। এমনকি তাদের সাথে ও পেছনে জড়ো হয়ে জালিমশাহীর শেকড় উপড়ে ফেলতে সক্রিয় হয়।